আধুনিক পদ্ধতিতে
বারি বিলাতি ধনিয়া-১ এর উৎপাদন

মসলা গবেষণা কেন্দ্র, শিবগঞ্জ, বগুড়া

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

আধুনিক পদ্ধতিতে
বারি বিলাতি ধনিয়া-১ এর উৎপাদন

রচনা ও গবেষণায়

ড. শৈলেন্দ্র নাথ মজুমদার
মো. ইকবাল হক স্বপন
ড. মোহা. মনিরুজ্জামান
ড. শাহানা আকতার

সম্পাদনায়

ড. ভাগ্য রানী বণিক
মো. হাসান হাফিজুর রহমান

মসলা গবেষণা কেন্দ্র, শিবগঞ্জ, বগুড়া
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০১৫, ভাদ্র ১৪২২
১০০০ কপি

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

স্বত্ব সংরক্ষিত
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুদ্রণে
রীতা আর্ট প্রেস
১৩/ক/১/১, কে এম দাস লেন, ঢাকা-১২০৩
ফোন : ৯৫৬৪৫৪০

মুখবন্ধ

বিলাতি ধনিয়া একটি উচ্চমূল্যের ও অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত লাভজনক মসলা জাতীয় ফসল। উচ্চ পুষ্টিমান, প্রখর সুগন্ধি এবং উন্নত ভেষজ গুণের কারণে পাতা জাতীয় এ ফসলটির চাষাবাদ ও ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। বিলাতি ধনিয়ার পাতা মসলা হিসেবে ব্যবহারে খাবার সুগন্ধিযুক্ত ও সুস্বাদু হয়। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও মাটি বিলাতি ধনিয়া চাষের উপযোগী। এদেশের দক্ষিণ পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে এটি একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন এলাকায়ও বাণিজ্যিকভাবে এর চাষ হচ্ছে। সঠিক চাষাবাদ পদ্ধতি ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা না জানার ফলে অনেক সময় কৃষকগণ আশানুরুপ ফলন পাচ্ছেন না। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মসলা গবেষণা কেন্দ্র থেকে উদ্ভাবিত **বারি বিলাতি ধনিয়া-১** জাতটি উচ্চফলনশীল, সুগন্ধিযুক্ত, উচ্চতর পুষ্টি ঔষধি গুণাগুণ সমৃদ্ধ। উন্নত পদ্ধতিতে এ জাতটি চাষাবাদে এর ফলন বৃদ্ধি পাবে, অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি কৃষকের আয় বৃদ্ধি সম্ভব হবে।

উদ্ভাবিত **বারি বিলাতি ধনিয়া-১** জাতটি সম্পর্কিত তথ্যাবলী ও এর উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি সম্বলিত এই পুস্তিকাটি চাষী, সম্প্রসারণ কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়ক ও সমাদৃত হবে বলে আশা রাখি।

বারি বিলাতি ধনিয়া-১ জাতটি উদ্ভাবন ও **"আধুনিক পদ্ধতিতে বারি বিলাতি ধনিয়া-১ এর উৎপাদন"** পুস্তিকাটি রচনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(ড. ভাগ্য রানী বণিক)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ)
বারি, গাজীপুর

আধুনিক পদ্ধতিতে বিলাতি ধনিয়ার চাষ

বিলাতি ধনিয়া বা **বাংলা ধনিয়া** বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলের একটি অন্যতম লাভজনক অর্থকরী মসলা ফসল। পাতা জাতীয় ফসলটি পুষ্টিসমৃদ্ধ, প্রখর সুগন্ধিযুক্ত এবং উন্নত ভেষজ গুণে সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় এর চাষাবাদ ও বিস্তৃতি দ্রুত বাড়ছে। ১৯৯৯ সালে সারা বিশ্বে এর মোট উৎপাদন নয় হাজার টন থেকে ২০০৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় পাঁচ লক্ষ টনে (Ekpong and Sukprakran, 2008) Avi ২০১০ এ যার পরিমাণ ১০ লক্ষ টন।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকার বাহিরে এর পরিচিতি কম এবং ইংরেজি কোন সুনির্দিষ্ট নাম না থাকায় বিভিন্ন দেশে এটি ৭৩টি ভিন্ন নামে পরিচিত। তবে অনেক দেশে এটাকে False Coriander, Long Coriander, Spiny Coriander, Culantro, Cilantro, Shadobeni, Feetweed, বনঢুলা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আবার ফিলিপাইন, থাইল্যান্ডসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এটাকে *Eryngium* বা *Eryngo* বলা হয়। প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী ড. মামুনুর রশীদ তাঁর "সবজি বিজ্ঞান" বইটিতে এটিকে **বাংলা ধনিয়া** নামে অভিহিত করেছেন।

উৎপত্তি ও বিস্তার

প্রাচুর্যতা ও বিস্তৃতির ধরন দেখে আসাম, মায়ানমার ও বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল এ প্রজাতিটির উৎপত্তিস্থল বলে ধারণা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ট্রপিক্যাল আমেরিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভিয়েতনাম, আসাম এবং বাংলাদেশই এর উৎপত্তিস্থল। ক্রমে এ ফসলটি পাক ভারত উপমহাদেশসহ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করেছে। ভিয়েতনাম এবং ওয়েষ্ট ইন্ডিজ এর ত্রিনিদাদ ও টোবাগো থেকে কুলিনারী হার্ব বা সালাদ জাতীয় অর্থকরী ফসল হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়। বর্তমানে সিরিয়া, জর্ডান, পুয়ের্তোরিকো, মেক্সিকো, দক্ষিণ আমেরিকা, কন্টিনেন্টাল ও ট্রপিক্যাল আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, চীন, ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, বাংলাদেশ এর ব্যাপক চাষাবাদ ও সম্প্রসারণ লক্ষ্য করা যায়। এ ফসলটি ক্রমে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল হয়ে উঠছে। উন্নত দেশসমূহের বিশেষ করে লন্ডন, নিউইয়র্ক ও টরেন্টোতে বসবাসকারী অভিবাসীগণ এ উপমহাদেশ থেকে বিলাতি ধনিয়া আমদানী করে। বহুদিন পূর্ব থেকেই এদেশের দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে এর চাষ লক্ষ্য করা যায়। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ওয়াগ্গা, বেতবুনিয়া, কাউখালী, ঘাগড়া, প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপকভাবে এবং খাগড়াছড়ি, বান্দরবন, কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালী, ফরিদপুর ও গাজীপুর সহ এদেশের অনেক এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে এ ফসলটির চাষ হচ্ছে। বিলাতি ধনিয়া বর্তমানে এদেশের অধিকাংশ কিচেন গার্ডেন এর একটি অপরিহার্য্য উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে।

উদ্ভিদতত্ত্ব

Apeaceae পরিবারের *Eryngium* গণের ২২৮টি প্রজাতির একটি হল *Eryngium foetidium* L. বিলাতি ধনিয়া বা বাংলাধনিয়া। Apeaceae পরিবারের অন্য তিনটি সুপরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত সুগন্ধি হার্ব যেমন পার্সলি (রাঁধুনি), সেলারি ও পার্সনিপ এর মতোই এটি একটি ক্ষুদ্রাকার দীর্ঘজীবি বিরুৎ। এর কাণ্ড অস্পষ্ট ও ভূ সংলগ্ন। কিন্তু ফুল আসার সময় উপরদিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং কাণ্ড ফাঁপা হয়ে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়। পাতা দৈর্ঘে ১৫-২০ সেমি ও প্রস্থে ২-৩ সেমি। পত্রফলকের কিনারা সামান্য খাঁজযুক্ত ও অগ্রভাগ ছোট ছোট সুক্ষ্ম কাঁটাযুক্ত। এটি একটি ছায়াপ্রিয় উদ্ভিদ। গবেষণায় দেখা গেছে মোট আগত সূর্যালোকের শতকরা ৫০ থেকে ৭৫ ভাগই এর জন্য যথেষ্ট। পূর্ণ সূর্যালোকে এর পাতা কন্টকাকার ক্ষুদ্র, শক্ত ও খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে এবং আগাম ফুল এসে যায়। ফুল ক্ষুদ্রাকৃতির, বৃন্তবিহীন এবং মঞ্জুরীদণ্ডে ঘন সন্নিবেশিত থাকে। ফুল ফোঁটার পর থেকে বীজ পরিপক্ক হতে ৪০-৪৫ দিন সময় লাগে। বীজ দ্বি-বীজপত্রী, ক্ষুদ্রাকৃতির এবং অমসৃণ। প্রতি হাজার বীজ এর ওজন ০.৪ থেকে ০.৫ গ্রাম হয়ে থাকে। ক্রমবর্ধমান শাখার অক্ষীয় মঞ্জুরীতে ফুল উৎপাদিত হতে থাকে এবং গোড়ার দিকের বীজ আগে পাকে। সাধারনত বীজ, পার্শ্ব সাকার এবং অস্থানিক (কক্ষ মুকুল) চারা থেকে এর বংশবিস্তার হয়ে থাকে।

আবহাওয়া ও মাটি

বিলাতি ধনিয়া প্রধানত খরিফ মৌসুমের ফসল। নাতিশীতোষ্ণ থেকে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া বিলাতি ধনিয়া চাষের জন্য উপযোগী। অত্যধিক শীতল আবহাওয়ায় (<১০°সে) এর বৃদ্ধি কমে যায়। বিলাতি ধনিয়া প্রখর সূর্যালোকের চেয়ে ছায়াতে বা হালকা বিক্ষেপিত (৫০-৭৫%) আলোতে ভাল পাতা উৎপাদন করে।

প্রায় সব ধরনের মাটিতেই বিলাতি ধনিয়া জন্মে। এ ধনিয়া চাষের জন্য প্রচুর জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ সুনিষ্কাশিত দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ মাটি বেশি উপযোগী। ভাল ফলনের জন্য মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকা প্রয়োজন অথচ দাড়ানো পানিও সহ্য করতে পারে না। এ জন্য প্লাবন সেচ এর চেয়ে ঝরনা সেচ এ ধনিয়া চাষের জন্য বেশি উপযোগী। পাহাড়াঞ্চলে সাধারনত পাহাড়ের পাদদেশীয় সমতলে এর চাষ এবং ঢালে বীজ উৎপাদন করা হয়ে থাকে। তবে কোন কোন পাহাড়ের উর্বর ঢালে এর পাতাও উৎপাদন করা হয়। এদেশের সমতল ভূমিতেও সাফল্যজনকভাবে এর চাষ করা যায় এবং ভাল ফলন পাওয়া যায়।

জমি তৈরি

বিলাতি ধনিয়া চাষের জন্য খুব ভালভাবে জমি প্রস্তুত করা প্রয়োজন। ৫/৬ টি চাষ ও উপর্যুপরি মই দিয়ে মাটির ঢেলা ভেঙ্গে ঝুরঝুরা করা প্রয়োজন। কেননা বিলাতি

ধনিয়ার বীজ খুবই ক্ষুদ্রাকৃতির (বালির দানার মত ছোট) হওয়ায় বড় আকারের ঢেলার মধ্য দিয়ে তাদের গজানো সম্ভব নয়। এজন্য মটর দানা বা মার্বেলের চেয়ে বড় আকারের ঢেলা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বীজ বপনের পূর্বে মাটিতে প্রয়োজনীয় রস ('জো' অবস্থা) থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজনে বপন পূর্ব সেচ দিয়ে নেয়া যেতে পারে। এক মিটার চওড়া বেড এবং ৩০ সেন্টিমিটার চওড়া নালা রাখা প্রয়োজন।

বপন সময়

নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি (মধ্য কার্তিক - মধ্য ফাল্গুন) মাস বিলাতি ধনিয়ার বীজ বপনের উত্তম সময়। মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকলে মার্চ মাস পর্যন্ত বপন করা যেতে পারে। তবে বীজ বপনের পরেও অন্তত ২০-২৫ দিন কম তাপমাত্রা থাকা প্রয়োজন। কেননা বিলাতি ধনিয়া বীজের অংকুরোদগমের জন্য নিম্ন তাপমাত্রা (১২-২০° সে.) প্রয়োজন। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর গজানোর হার কমে আসে।

জাত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মসলা গবেষণা কেন্দ্র থেকে ২০১৩ সালে **বারি বিলাতি ধনিয়া-১** নামে একটি জাত অনুমোদিত হয়েছে। এ জাতটির প্রতিটি গাছের গড় ওজন ৬.৮১ গ্রাম, পাতার সংখ্যা ৭.৪ টি, পাতার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ১৪.১ ও ৩.২ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। এর পাতা আকর্ষণীয় সবুজ রঙের সুগন্ধিযুক্ত, সুস্বাদু, উচ্চতর পুষ্টি ও ওষধি গুণাগুণ সমৃদ্ধ। এ জাতটি বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী ও উচ্চফলনশীল (প্রতি হেক্টরে পাতা ৩০-৫০ টন এবং বীজের ফলন ৪০০-৫০০ কেজি)।

বারি বিলাতি ধনিয়া-১ এর ফসল

বারি বিলাতি ধনিয়া-১ এর সংগ্রহপোযোগী গাছ

বীজ শোধন

বিলাতি ধনিয়ার বীজ আকারে ছোট হওয়ায় এর তেজ (vigour) কম থাকে এছাড়া এতে Coumarin নামক এক ধরনের পদার্থ থাকে যা অংকুরোদ্গম এ

বাধা দেয়। ফলে সাধারনভাবে (শোধন ছাড়া) বপন করলে এর শতকরা মাত্র ৬-১০ ভাগ গজায়। সর্বোচ্চ ফলন পেতে এভাবে প্রতি হেক্টরে ৪০ কেজি হারে বা প্রতি বর্গমিটারে ৪ (চার) গ্রাম অর্থাৎ প্রতি শতাংশ জমিতে ১৬০ গ্রাম বীজ বপন করা প্রয়োজন। চাহিদার তুলনায় বিলাতি ধনিয়ার বীজের প্রাপ্যতাও অনেক কম। এ অবস্থায় প্রাইমিং ও হরমোন প্রয়োগের দ্বারা বীজের অংকুরোদ্গমের হার বাড়িয়ে বীজহার কমিয়ে খরচ কমানোর পাশাপাশি অধিক পরিমাণে জমিতে চাষ করা যেতে পারে।

বিলাতি ধনিয়ার বীজে অংকুরোদ্গম বাধাদানকারী Coumarin পানিতে সহজেই দ্রবণীয়। ফলে বেশি পরিমাণে পানিতে বীজ ৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে Coumarin পানিতে চলে যায় এবং ভিজানো পানি চায়ের লিকারের মত লালচে রঙ ধারণ করে। ঘন ছাঁকনি বা পাতলা কাপড় দিয়ে বীজ ছেঁকে পানি ফেলে দিয়ে ৪ ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখতে হবে। পরে একই পদ্ধতিতে আবার ভিজাতে হবে এবং ছাঁকতে হবে। এভাবে ৬-৮ বার বিলাতি ধনিয়ার বীজ (৭২-৯৬ ঘণ্টা) প্রাইমিং করে গজানোর হার দ্বিগুন করা যায়। এরপর জিবারেলিক এসিড (GA_3 ৫০০ পিপিএম) এবং কাইনেটিন (৫০ পিপিএম) নামক হরমোন মিশ্রণে বীজ এক ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে তারপর পানি ঝরিয়ে হালকা শুকিয়ে বপন করলে চারগুন বা ৭০-৭৫% অংকুরোদ্গম পাওয়া যায়। এতে প্রয়োজনীয় বীজ এর এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ হেক্টরপ্রতি ৮-১০ কেজি বা শতাংশে ৩০-৪০ গ্রাম বীজই যথেষ্ট। এতে প্রতি হেক্টরে ১৫০০/- টাকার হরমোন প্রয়োজন হলেও বীজের খরচ প্রায় ১,৫০,০০০/- টাকা কমে যায়। আর অল্প বীজ এ বেশি জমিতে আবাদ করে কৃষক বেশি লাভবান হতে পারে।

বীজ বপন

বিলাতি ধনিয়ার ক্ষুদ্রাকৃতির বীজ সমানভাবে বোনা বেশ কষ্টকর বিধায় বালির সাথে মিশিয়ে বীজ বোনা ভাল। ১০ সেমি দূরত্বে সারিতে অথবা ছিটিয়ে বীজ বপন করা যায়।

ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে বীজ বপনের পর মাটি উপরের স্তরের (০.৫ সেমি গভীরতা পর্যন্ত) সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সারিতে বপন করলে ১.০-১.৫ সেমি গভীর নালা করে নালাতে সারিতে বীজ ছিটিয়ে দুইপাশের মাটি দিয়ে হালকাভাবে ঢেকে দিতে হবে। অতি ক্ষুদ্রাকৃতির বীজ হলেও প্রতি শতাংশে ১৬০ গ্রাম অথবা হরমোন মিশ্রণে চুবানো ৪০ গ্রাম বীজ আপাত দৃষ্টিতে অনেক বেশি বলে মনে হয়। কিন্তু এর সব বীজ এক সাথে গজায় না। একই দিনে বোনা বীজ গজাতে ১৫ থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত সময় নেয়। ফলে একবার বীজ বপন করেও কৃষক অনেক বার (৪-৮ বার) ফসল উত্তোলন করতে পারে।

ছাউনীসহ বিলাতি ধনিয়ার প্লট

বিলাতি ধনিয়ার ৩০ দিন বয়সী চারাগাছ

সার প্রয়োগ

বিলাতি ধনিয়ার বিভিন্ন বয়সী গাছ

বিলাতি ধনিয়া পাতা জাতীয় ফসল হওয়ায় এর জন্য ইউরিয়া ও পটাশ জাতীয় সার বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বীজ বপনের পূর্বে শতাংশ প্রতি ৮০ কেজি পচা গোবর বা আবর্জনা পচা সার (কম্পোস্ট) ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৮০০ গ্রাম টিএসপি ও ৮০০-১০০০ গ্রাম এমওপি শেষ চাষের সময় বীজ বপনের ৪/৫ দিন পূর্বে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা গজানোর ৩০ দিন পর থেকে ১ মাস অন্তর অথবা প্রতি দুইবার ফসল সংগ্রহের পর প্রতি শতাংশে ২০০ গ্রাম হারে ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তবে ইউরিয়া উপরি প্রয়োগের পরপরই হালকা ঝরনা সেচ দিতে হবে। এতে সার ভালভাবে মাটিতে শোষিত হবে আর পাতায় লেগে থাকা ইউরিয়া দূর হয়ে পাতা পুড়ে যাওয়ার হাত থেকে ফসল রক্ষা পাবে। এভাবে প্রতি হেক্টর জমিতে মোট ২০ টন কম্পোস্ট, ৩৫০ কেজি ইউরিয়া, ২০০ কেজি টিএসপি এবং ২৫০কেজি এমওপি (পটাশ) সারের প্রয়োজন হবে। শতাংশ প্রতি এ সারের পরিমাণ হবে কম্পোস্ট ৮০ কেজি, ইউরিয়া ১.৫ কেজি, টিএসপি ৮০০ গ্রাম ও এমওপি ১০০০ গ্রাম। তবে বীজ উৎপাদনের জন্য উল্লেখিত সারের সাথে হেক্টরপ্রতি ১২৫ কেজি টিএসপি ও ১ কেজি বোরন (সলুবোর বা বোরাক্স আকারে) অর্থাৎ প্রতি শতাংশে যথাক্রমে ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ৪ গ্রাম বোরন বীজ বপনের পূর্বে অতিরিক্ত প্রয়োগ করতে হবে।

ছাউনী প্রদান

বিলাতি ধনিয়ার পাতা নরম, চওড়া ও মসৃণ হওয়ার জন্য জমিতে ছাউনী দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় প্রখর সূর্যালোকে পাতা শক্ত ও কাঁটাযুক্ত হয়ে যায় এবং

দ্রুত ফুল উৎপাদনের ফলে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়। আবার সম্পূর্ণ আলোক বিবর্জিত হলেও ফলন ভাল হয় না। শুধুমাত্র ছাউনীর ঘনত্বের বা আলো প্রতিরোধ মাত্রার উপর এর গুণাগুণ ও ফলন নির্ভর করে। বাঁশের তৈরি মাচায় নারিকেল পাতা, ছন, ধৈঞ্চা কলাপাতা দ্বারা ছাউনি তৈরি করা যেতে পারে। এতে উৎপাদন খরচ অনেক কম হয় ও লাভ বেশি হবে। আবার হালকা মাচার উপর কুমড়া জাতীয় গাছ তুলে দিয়ে তা থেকে বেশ কিছু বাড়তি ফলন পাওয়া যেতে পারে।

সেচ ও নিকাশ

বিলাতি ধনিয়ার জন্য সব সময় পর্যাপ্ত রস থাকতে হবে আবার গাছের গোড়ায় পানি জমতে দেওয়া যাবে না। এজন্য ঝরনা পদ্ধতিতে মাটির অবস্থা বুঝে (৪-৭ দিন পরপর) হালকা সেচ দেওয়া ভাল। বেডের পাশের নালা দিয়ে বৃষ্টির সময়ে অতিরিক্ত পানি বের করে দেওয়ায় সুব্যবস্থা থাকতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

বিলাতি ধনিয়ার সবচেয়ে বড় শত্রু আগাছা। বীজ বপনের পরে চারা গজানোর পূর্ব থেকে ফসল তোলার শেষ পর্যায় পর্যন্ত জমিকে সর্বদা আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। সাধারনত ৪ মাস বয়স থেকে বাংলা ধনিয়ার গাছে ফুল আসা শুরু হয়। বাংলা ধনিয়ার গাছের পুষ্পদণ্ড দেখা দিলে তা গোড়া থেকে ভেঙ্গে দিতে হবে। অন্যথায় পাতা উৎপাদন ব্যহত হয় এবং ফলন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। তবে জুন-আগস্ট মাসে গাছ পাতলা করে রেখে দিলে পরবর্তী বৎসরের জন্য বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

বিলাতি ধনিয়ার রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

সীমিত পরিসরে চাষাবাদে এতদিন এ ফসলটির তেমন রোগবালাই পরিলক্ষিত হয়নি। বিলাতি ধনিয়ার চাহিদা, বাজার ও চাষাবাদ বৃদ্ধির সাথে সাথে এর উপর গবেষণামূলক অনুসন্ধান চলছে এবং নতুন অনেক তথ্য বেরিয়ে আসছে। সীমিত পরিসরে হলেও বিভিন্ন রোগের কারণ ও দমন ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা চলছে।

ড্যাম্পিং অফ (Damping off) বা ধ্বসাধরা রোগ

বিলাতি ধনিয়া চাষের ক্ষেত্রে এ রোগটি সবচেয়ে ক্ষতিকর এবং মারাত্মক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এ রোগের আক্রমণে প্রায় সমস্ত ফসলই নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি ক্ষতির পরিমাণ ১০০% পর্যন্ত হতে পারে।

রোগের লক্ষণ : চারা অবস্থায় এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। গাছ ছোট থাকা অবস্থায় এক এক স্থানে হঠাৎ করে কচি চারাগাছ মারা যাওয়া শুরু করে এবং তা ক্রমশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্লটের সব গাছ মারা যায়।

Pythium, Phytophthera, Sclerotium, Fusarium ইত্যাদি ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। উচ্চ তাপমাত্রা, অধিক আর্দ্রতা ও বেশি ভেজা মাটিতে এ রোগ বেশি হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা : গোড়ায় পানি জমলে বা মাটি বেশি স্যাঁতসেতে হয়ে গেলে কচি চারা গাছের ক্ষেত্রে গোড়া পচা অথবা ড্যাম্পিং অফ রোগ ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে। তবে নিম্নোক্ত সমন্বিত পদ্ধতি অবলম্বন করে রোগের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ বা সর্বনিম্ন রাখা সম্ভব।

- সুনিষ্কাশিত জমিতে আবাদ এবং প্লটগুলি উঁচু করে ভালভাবে পানি নিকাশের ব্যবস্থা রাখা যেন কোন ক্রমেই বৃষ্টির মৌসুমে মাটি বেশি স্যাঁতসেতে হয়ে না যায়।
- শস্য পর্যায় অবলম্বন বা একই জমিতে বারবার বিলাতি ধনিয়ার চাষ না করা এবং রোগমুক্ত জমি থেকে বীজ সংগ্রহ।
- চাষের পূর্বে জমির আগাছা বা অন্যান্য আবর্জনা পুড়িয়ে নেয়া।
- বীজ বপনের পূর্বে প্রতি বর্গমিটার জমিতে ১ লিটার হারে ১% ফরমালিন (প্রতি লিটার এ ১০ মিলি) দ্রবণ দ্বারা মাটি শোধন করে পলিথিন দ্বারা ৭ দিন ঢেকে রেখে তারপর তিন দিন আলাগা রেখে বীজ বপন করা। এতে মাটিস্থ ছত্রাক মারা যাওয়ায় রোগের প্রকোপ কম হবে।
- বীজ বপনের পূর্বে অথবা রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে প্রতি বর্গমিটার জমিতে ১ লিটার হারে ১০০ : ১ : ১ বোর্দোমিশ্রণ (পানি : চুন : তুঁতে) প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। একটি পাত্রে ৫ লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম চুন এবং অপর একটি পাত্রে ৫ লিটার পানিতে ১০০ প্রাম তুঁতে ($CuSO_4$) ভালভাবে মিশিয়ে উভয় মিশ্রণ তৃতীয় একটি পাত্রে একসঙ্গে ঢেলে মিশিয়ে নিলেই বোর্দোমিশ্রণ তৈরি হয়ে যাবে। এ মিশ্রণ আক্রান্ত জমিতেও ৭/১০ দিন অন্তর ব্যবহার করা যায়।
- আক্রমণ দেখা যাওয়ার সাথে সাথে নোইন (Knowin) নামক ছত্রাক নাশক ০.২৫% হারে ভালভাবে গাছ ও গাছের গোড়ায় মাটি ভিজিয়ে ৭ দিন অন্তর ২/৩ বার স্প্রে করলে মোটামুটিভাবে এ রোগ দমন করা যায়।

পাউডারি মিলডিউ (Powdery mildew)

পাউডারি মিলডিউ রোগটি বিলাতি ধনিয়ার গুণগত মানের জন্য বেশি ক্ষতিকর। এ রোগের আক্রমণে পাতার উপর সাদা পাউডারের মত ছত্রাকের স্পোর দেখা যায় এবং পরে পাতা হলুদ বর্ণ ধারণ করে খাবার অনুপযোগী হয়ে যায়। এতে ফলন

অত্যন্ত কমে যায় এবং ফসলের বাজার মূল্য একবারেই কমে যায়। বেশি আক্রমণে পুরো ফসল বাজারজাত করার অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

রোগের লক্ষণ : পাতার উপর প্রথমে হালকা সবুজাভ সাদা দাগ লক্ষ্য করা যায় পরে আস্তে আস্তে ধুসর সাদা হয়ে আসে এবং ২/১ দিনের মধ্য পাউডারের মত গুঁড়া ছত্রাক স্পোর পাতার উপর দেখা যায়। আক্রান্ত পাতার নিচের দিক থেকে হলুদ হয়ে আসে এবং তা খাবার অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

রোগের কারণ : ইরাইসিফি (*Erysipheae* sp.) প্রজাতির একপ্রকার ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। শুষ্ক আবহাওয়ায় এ রোগের আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে। বৃষ্টির মৌসুমে এ রোগ কমে আসে।

প্রতিকার

- রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা এবং পূর্ববর্তী ফসলের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলা।
- শুকনা মৌসুমে ঘন ঘন পানি সেচ দেওয়া। সম্ভব হলে ঝরনা এর সাহায্যে গাছ পাতা ভিজিয়ে সেচ প্রদান করা। এতে ছত্রাকের স্পোরগুলি মাটিতে পড়ে যায় এবং রোগের আক্রমণ কম হয়।
- রোগ দেখা দেওয়ায় সাথে সাথে থায়োভিট বা যে কোন সালফার ঘটিত ছত্রাক নাশক ০.৩% মাত্রায় (প্রতি লিটারে ৩ গ্রাম) ভালভাবে পাতা ও গাছ ভিজিয়ে ৭ দিন অন্তর ২/৩ টি স্প্রে প্রদান করে এ রোগ ভালভাবেই দমন করা যায়।

ব্যাকটেরিয়াল লিফ স্পট (leaf spot) এবং উইল্ট (Wilt) বা ঢলে পড়া রোগ

ইদানিং ব্যাকটেরিয়াল লিফ স্পট বা পাতায় দাগ রোগটি ব্যাপক আকারে দেখা যাচ্ছে। এ রোগের ফলে পাতা খাওয়ার অনুপযোগী হয়, বাজার মূল্য কমে ও বীজ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

রোগের লক্ষণ: গাছের পাতায় কণার থেকে প্রথমে বাদামী বা কালচে বাদামী দাগ পড়ে। এ দাগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরো গাছটিই এক সময় মরে যায়। কখনো কখনো বীজ উৎপাদনের জন্য জমিতে রেখে দেওয়া গাছের উপরের দিক থেকে বা কখনো সম্পূর্ণ গাছটিই হলুদ হয়ে আসে এবং কিছুদিনের মধ্য মারা যায়। অনেক সময় মারা যাওয়া গাছের গোড়ার দিকে পচনও দেখা যায়। পুষ্পমঞ্জুরী বের হওয়ার পর এ রোগ বেশি দেখা যায়।

রোগের কারণ: বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক এবং *Erwinia eryngii* নামক ব্যাকটেরিয়া এর সমন্বয়ে এ রোগ হয়ে থাকে। এ ব্যাকটেরিয়াটি মাটিতে ও বীজে অবস্থান করে। উষ্ণ তাপমাত্রা, স্যাঁতসেতে মাটি ও আর্দ্র আবহাওয়া এ রোগের উপযোগী। বেশি ভেজা মাটি ও অপেক্ষাকৃত উষ্ণ আবহাওয়ায় এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়।

প্রতিকার

- রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ এবং পূর্ববর্তী ফসলের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলা। পাহাড়ের ঢালে বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা করে এবং ড্যাম্পিং অফ রোগের মতো আইপিএম ভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এ রোগের মাত্রা কমানো যেতে পারে।

- রোভরাল (Rovral) নামক ছত্রাকনাশক ০.৩% মাত্রায় (প্রতি লিটারে ৩ গ্রাম) ভালভাবে পাতা ও গাছ ভিজিয়ে ৭ দিন অন্তর ২/৩ টি স্প্রে প্রদান করে এ রোগের প্রকোপ কমানো যায়।

- দ্বিগুন মাত্রায় (১মিলি/লিটার পানিতে) টিল্ট নামক ছত্রাকনাশক অথবা ১০০০ পিপিএম টেট্রাসাইক্লিন ও ০.২% কপার অক্সিক্লোরাইড ১০ দিন অন্তর প্রয়োগেও সুফল পাওয়া যায়।

- চীন থেকে আমদানীকৃত Chlorobromoisocyanuric Acid নামক একটি ব্যকটেরিওসাইড এবং স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন (স্ট্রেপ্টোমাইসিন + টেট্রাসাইক্লিন) এর বাণিজ্যিক ফরমুলেশন এ রোগের জন্য কার্যকরী প্রতীয়মান হয়েছে। পাতা উৎপাদনের ক্ষেত্রে রোগ আক্রমণের আগেই সংগ্রহ করা ভাল।

ফসল সংগ্রহ

সাধারনত বিলাতি ধনিয়ার সম্পূর্ণ গাছটাই তুলে সংগ্রহ করা হয়। ১৫-২৫ সেমি এর মত (পাতা সহ) লম্বা গাছগুলি তুলে নেওয়া হয়। এভাবে বড় চারা গুলি তুলে নেয়ার পর ইউরিয়া সার প্রয়োগ ও আগাছা বাছাই করার পর অবশিষ্ট গাছগুলি বড় হতে থাকে এবং ১৫-২০ দিনের মধ্য পূণরায় আহরণযোগ্য হয়। এভাবে ৪-৮ বারে প্রতি হেক্টর জমি থেকে সর্বমোট ৩০ থেকে ৫০ টন (প্রতি শতাংশে ১২০-২০০ কেজি) পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। তবে কিচেন গার্ডেন বা ছোট প্লটে লাগানো গাছ থেকে গৃহিনীরা সরাসরি পাতা তুলেও ব্যবহার করতে পারেন। এভাবে একবার রোপণ করা গাছ থেকে বহুদিন পর্যন্ত পাতা সংগ্রহ করা যায়।

বাজারজাতকরণ

বিলাতি ধনিয়ার বড় গাছগুলি সংগ্রহ এবং পরিষ্কার করার পর সাধারনত এক কেজি করে আটি বেঁধে বাজারজাত করা হয়। বাশের তৈরি খাঁচা বা প্লাষ্টিক ক্রেটে নেওয়া হলে তা বেশ ভাল থাকে । পরবর্তীতে পাইকারী বাজার থেকে খুচরা ব্যবসায়ীরা আটি খুলে অল্প করে বা ওজন দরে বিক্রয় করেন। কোথাও কোথাও সম্পূর্ণ গাছ না তুলে শুধুমাত্র পাতা তুলে আটি বেঁধে বিক্রি করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অধিক সময় ধরে একই গাছ থেকে পাতা পাওয়া যায়।

প্রতি হেক্টর জমিতে বিলাতি ধনিয়া চাষাবাদের তুলনামূলক লাভ-ক্ষতির মোটামুটি হিসাব নিম্নরূপ হতে পারে

খরচের খাত	প্রতি হেক্টর (টাকা)	প্রতি শতাংশ (টাকা)
জমি প্রস্তুত ও বেড তৈরি	২৫,০০০.০০	৩০০.০০
বীজ (গড়ে ১৫ কেজি/হেক্টর)	৭৫,০০০.০০	৩০০.০০
সার, সেচ ও বালাইনাশক	২৬,০০০.০০	৩০০.০০
ছাউনী তৈরি (বাঁশ, রশি, জিআই তার শনঘাস/পাটকাঠি/ধৈঞ্চা/নাইলন নেট ও শ্রম)	১,০০,০০০.০০	৫০০.০০
সার মিশানো, বীজ বপন ও বালাইনাশক প্রয়োগ	১৫,০০০.০০	১০০.০০
আগাছা দমন, ফুল ভাংগা ও ফসল তোলা	৭৫,০০০.০০	৩০০.০০
বাজার জাত ও অন্যান্য খরচ	৪৫,০০০.০০	৩০০.০০
মোট খরচ	**৩,৬১,০০০.০০**	**২,১০০.০০**
আয়		
ফ্রেশ বিলাতিধনিয়া (৪৫ টন/হেক্টর)	৪৫,০০,০০০.০০	১৮১০০.০০
বীজ (৪০০ কেজি/হেক্টর)	২০,০০,০০০.০০	৮০০০.০০
আয় ব্যয় অনুপাত (পাতা/বীজ)	১২.৪৬ /৫.৫৪	৮.৬১/৩.৮০

বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

বিলাতি ধনিয়ার গাছে ১২০-১৫০ দিন বয়সে ফুল আসে । ফুল ফোটা থেকে বীজ পরিপক্ক হতে দুই থেকে আড়াই মাস সময় লাগে। গাছ পাতলা করে (১০×১০ সেমি দূরত্বে) উৎপন্ন পুষ্পদণ্ডসহ রেখে দিলে পরবর্তী বৎসরের জন্য বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হয় । প্রথমবার বীজ সংগ্রহের পর গাছ রেখে দিলে পরবর্তীতে আরেকবার বীজ সংগ্রহ করা যায়। বীজ উৎপাদনের জন্য পাতা উৎপদনের চেয়ে সার বেশি পরিমাণে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। প্রতি হেক্টর জমিতে মোট ২০ টন কম্পোস্ট, ৩৫০ কেজি ইউরিয়া, ৩২০ কেজি টিএসপি, ২৫০কেজি এমওপি (পটাশ) এবং ১ কেজি বোরন (সলুবোর বা বোরক্স আকারে) সারের প্রয়োজন হবে। সমস্ত কম্পোস্ট, টিএসপি, সলুবোর ও এক পঞ্চমাংশ ইউরিয়া ও পটাশ শেষ চাষের সময় এবং বাকি ইউরিয়া ও পটাশ সমান চার ভাগে ৪৫, ৭০, ৯৫ ও ১২০ দিন পরে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

গাছপ্রতি ১-৩টি পুষ্পদণ্ড বের হয় এবং প্রতিটি পুষ্পদণ্ডে বাইনারী বিভাজন পদ্ধতিতে ১০-২০টি করে পুষ্পমঞ্জুরী বের হয়। গাছে প্রথম ধাপে একটি, দ্বিতীয় ধাপে দুটি, তৃতীয় ধাপে চারটি, চতুর্থ ধাপে আটটি এভাবে পুষ্পমঞ্জুরী উৎপন্ন হয় । এর প্রতি ধাপের ব্যবধান কমবেশি সাত দিনের মত হয়ে থাকে। প্রতিটি পুষ্পমঞ্জুরীতে ২০ থেকে ৪০টির মত বৃন্তবিহীন সাদা ফুল ফোটে এবং পরে তা থেকে বীজ হয়। ফুল ফোটার দুই মাস পর বীজ হলুদ রঙের হয় এবং এর ১৫-২০

দিন পরে কালো হয়ে পুষ্পমঞ্জুরী থেকে ঝরে পড়ে। এজন্য নিচে বাটি বা পাত্র রেখে হাত দিয়ে হলুদ এবং কালো পুষ্পমঞ্জুরী ঘষে বীজ সংগ্রহ করলে ভাল বীজ পাওয়া যায়। তবে এ পদ্ধতি শ্রমসাপেক্ষ বলে কৃষকগণ পুরো গাছ কেটে রোদে শুকিয়ে মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করেন। এতে কিছু পুষ্ট বীজ এর সাথে অপুষ্ট বীজ ও সংগ্রহ করা হয় এবং পরে তা চিটা হয়ে যায় এবং গজায় না। গবেষণায় দেখা গেছে, চতুর্থ ধাপের বীজ হলুদ বর্ণ ধারণ করলে সংগ্রহ করা হলে বীজের ফলন বেশি ও গুণগত মান ভাল হয়। শতাংশপ্রতি ২-৩ কেজি বা হেক্টরপ্রতি ৪০০ থেকে ৬০০ কেজি পর্যন্ত বীজ পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রাকৃতির ও অশস্যল বীজ হওয়ায় বিলাতি ধনিয়ার বীজ এর অংকুরোদগম ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পায়। হালকা রোদে কাপড় বা কাগজের উপর হালকাভাবে বিছিয়ে ভালভাবে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়। সাধারন তাপমাত্রায় এক থেকে দুই মাস এবং রেফ্রিজারেটরে নিম্ন তাপমাত্রায় (২-৫° সে) বায়ুরোধী প্যাকেজিং এ সংরক্ষণ করলে এক বছর পর্যন্ত এর গ্রহণযোগ্য (৫০%) অংকুরোদগম ক্ষমতা বজায় থাকে। প্রখর রৌদ্রে বেশি শুকিয়ে গেলে এর তেজ (vigour) এবং অংকুরোদগম ক্ষমতা কমে যায়।

ব্যবহার ও পুষ্টি উপাদান

চিত্র: বিলাতি ধনিয়ার পুষ্পমঞ্জুরীসহ ও পুষ্পদণ্ড

বিলাতি ধনিয়ার পাতা ও কচি পুষ্পদণ্ড একাধারে সবজি, সালাদ এবং মসলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রান্নার কাজে তরকারিতে, ডাল, ভাজি ও নিরামিষে সুগন্ধি বৃদ্ধি করে। সালাদ হিসেবে, অন্যান্য সবজির সালাদের সাথে মিশ্রণে, সবজি রান্নায়, মাংসের সাথে, চাটনিতে, চপ, ডাল, স্যুপএ, প্রিজার্ভে, আচারে এবং ভর্তা করেও খাওয়া যায়। কচি পাতা কুচি করে কেটে ঝালমুড়িতে অত্যন্ত মজাদার। কচি পাতা বেঁটে এর সাথে লবণ, মরিচ ও সরিষার তেল সমন্বয়ে তৈরিকৃত পেষ্ট অত্যন্ত সুস্বাদু যা এককভাবে বা অন্য কোন তরকারীর সাথী উপাদান হিসেবে ভাতের সাথে খাওয়া যায়। ছাড়াও বেসন দিয়ে বিলাতি ধনিয়া পাতার বড়া তৈরি করে, পিয়াজুতে, সিঙ্গারার মধ্য এবং ভেজিটেবল রোল এ ভাল সুগন্ধি উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যায়। মসলা বা কুলিনারি ব্যবহারের পাশাপাশি এর বহুল প্রমাণিত অত্যাশ্চর্য ঔষধি গুণাগুণের জন্যও বিলাতি ধনিয়া সমভাবে সমাদৃত। এর পাতা ও কচি কাণ্ড পাকস্থলীর প্রদাহরোধী এবং এনালজেসিক হিসেবে কাজ করে। এটি ক্ষুধা উদ্রেককারী, হজমশক্তি বাড়ায়, পাকস্থলীর ব্যথা উপশম করে, আন্ত্রিক সমস্যা দূর করে এবং গ্যাস উদগীরণ কমায়। এর পাতা ও শিকড় সেদ্ধ করে সেই পানি পান করলে নিউমোনিয়া, ফ্লু, ডায়াবেটিস, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয় এবং ম্যালেরিয়ার জ্বর উপশম করে।

এ ফসলটির পুষ্টি গুণাগুণ অত্যন্ত উচ্চমানের। এর পাতা ও কাণ্ডে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ক্যারোটিন এবং রিবোফ্লাভিন রয়েছে। কচি পাতায় ৮৬-৮৮% পানি, ৩.৩% আমিষ, ০.৬% চর্বি, ৬.৫% শ্বেতসার, ১.৭% ছাই, ০.০৬% ফসফরাস, ১.২৫% আমিষ, ২৫ পিপিএম বোরন, প্রায় ৩% আঁশ, ০.১-০.৯৫% অত্যাবশ্যকীয় তৈল, ০.০২% লৌহ এবং একটি আশ্চর্য স্যাপোনীর রয়েছে। এর পাতা ভিটামিন এ (১০৪৬০ আ.ইউ.), বি$_2$ (৬০ মি.গ্রা.), বি$_1$ (০.৮ মি.গ্রা.) এবং সি (১৫০-২০০ মি.গ্রা./১০০ গ্রাম) এর একটি অসাধারন উৎস।

এর পাতা, কাণ্ড ও ফুলে ৬৮ টি বিভিন্ন উদ্বায়ী সুগন্ধি তৈল জাতীয় পদার্থ এবং এসিড যেমন ২-ডোডেসিনোয়িক এসিড (১৫.৫%) এবং ই-২-ডোডেসিনোয়িক এসিড (৪৫.৫%) ইত্যাদি রয়েছে যা এই সুগন্ধির কারণ। পাতার প্রধান উপাদান হল ই-২--ডোডেসিনাল (৫৯.৭%) এবং মুলের প্রধান উপাদান ২-ফরমাইল-১, ১, ৫-ট্রাইমিথাইল-সাইক্লোহেক্সা-২, ৪-ডাইএন-৬-অল (১৯.৮%) এবং ২, ৩, ৬ ট্রাইমিথাইল বেনজালডিহাইড (৩৭.৬%). এর বীজে ৩৭টি জৈব যৌগ রয়েছে যার মধ্যে ক্যারোটল (১৯.৩১%), ই-বিটাফার্নেসেন (৯.৯৮%), ই-এ্যানথোল (৭.৪৩%) এবংআলফা-পিনাইন (৭.৬৯%) প্রধান। এসব উদ্বায়ী সুগন্ধি তৈল জাতীয় পদার্থ এবং এসিড জাতীয় উপাদান সংগ্রহ করে উচ্চমূল্যর সুগন্ধি ও ভেষজ ঔষধ তৈরি করা যায়। এ কারণে শিল্পক্ষেত্রেও এর চাহিদা যথেষ্ট।

উপসংহার

বেশি উৎপাদন খরচ (২-২.৫ লক্ষ টাকা/হেক্টর) সত্ত্বেও বিলাতি ধনিয়ার ক্রমবর্ধমান চাহিদা, উচ্চ বাজার মূল্য এবং একক পরিমাণ জমিতে অধিক মোট আয় (প্রতি হেক্টর এ ২৫-৩০ লক্ষ টাকা) এ ফসলটিকে পার্বত্যাঞ্চলে কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে গেছে। বিলাতি ধনিয়া চাষ করে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানিরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে নিউইয়র্ক, টরেন্টো, মধ্যপ্রাচ্য, স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বাঙ্গালী হোটেলগুলিতে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বেড়ে এর বাজার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ কমে যাওয়ায় এসব বিদেশি বাজার ভারত, ওয়েষ্ট ইন্ডিজ এবং ভিয়েতনামী রপ্তানীকারকগণ দখল করে নিচ্ছে। আবার অনেক সময় ফড়িয়া ও পাইকারী ক্রেতাদের কারসাজিতে বাজারে যথেষ্ট দাম ও চাহিদা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন এলাকায় দাম কমিয়ে দেয়। ফলে কৃষকেরা নায্য মূল্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণ, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ এবং সঠিক মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণও অত্যন্ত প্রয়োজন। অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এ ফসলটির উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যেমন ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে তেমনি গবেষণালব্ধ ফলাফলের ব্যাপক প্রচার, কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও চাষাবাদের জন্য মূলধনের ব্যবস্থা (ব্যাংক ঋণ) করা দরকার।

www.bari.gov.bd

Publication No. 04 bklt/2015